# *Course Module*

**SEMESTER-II**
**Course : History Hons**
**Paper : CC-IV (Unit-3)**
**Teacher : Nilendu Biswas**

## Topic : The Arabian Invansion

❖ **সিন্ধু দেশে আরব শাসনের প্রকৃতি ঃ** দীর্ঘ ৩০০ বছর আরবরা সিন্ধুদেশ শাসন করেছিল । বিভিন্ন সূত্র থেকে সিন্ধু দেশে আরবদের প্রতিষ্ঠিত শাসন কাঠামোর পরিচয় পাওয়া গেছে । 'চাচনামা' গ্রন্থের লেখক মহম্মদ-আলি-হামিদ-আবুবকর কুফী ব্রাহ্মণাবাদ শহরে প্রবর্তিত রীতিনীতি বা আইনকানুনের যে বিবরণ দিয়েছেন তাকে সিন্ধু দেশে মহম্মদ বিন কাশিম প্রবর্তিত শাসননীতির নমুনা হিসাবে গণ্য করা যায় । আরবদের সিন্ধু অভিযানের প্রথম দিকে হিন্দু মন্দির ধ্বংসের উদাহরণ থাকলেও আরব শাসকগণ ধর্মীয় উদারতা প্রদর্শন করেন ।

শাসনকার্য পরিচালনায় মহম্মদ বিন কাশিম পরবর্তীকালের তুর্কি-আফগানদের মত ধর্মীয় গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দেননি । তাঁর অধীনে সিন্ধু শাসনব্যবস্থা উদার ও সহিষ্ণু ছিল । জিজিয়া কর প্রদানের পরিবর্তে হিন্দুরা পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করত । সরকার পরিচালনার কাজে মহম্মদ বিন কাশিমের একমাত্র বিবেচনা ছিল দক্ষ ও অভিজ্ঞ লোককে শাসনকাজে নিযুক্ত করা । 'চাচনামা' থেকে জানা যায় সমগ্র সিন্ধু প্রদেশ কয়েকটি ইকতা বা জেলায় বিভক্ত ছিল । ইকতার শাসনভার ছিল আরবীয় সামরিক অফিসারের হাতে । খলিফাকে সামরিক সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তারা নিজেদের অঞ্চলে স্বাধীন ভাবে শাসন করত । নিচু স্তরের শাসনভার স্থানীয় হিন্দু জনসাধারণের হাতেই ছিল । শাসক পরিবর্তন হলেও স্থানীয় শাসনরীতি অপরিবর্তিত থাকত ।

সিন্ধু দেশে আরবীয় শাসনব্যবস্থায় সিন্ধুর কর ব্যবস্থা প্রায় অপরিবর্তিত ছিল । সরকারি আয়ের প্রধান উৎস ছিল দুটি-- ভূমিরাজস্ব 'খারজ' ও 'জিজিয়া'। রাজস্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোরাণের নির্দেশ পালিত হয়েছিল । বিজিত অঞ্চলের জনসাধারণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে দাসত্ব, কর প্রদান ও জিজিয়া থেকে অব্যাহতি পেয়েছিল । যারা ধর্মান্তরিত হয়নি কেবল তাদের নিকট থেকেই জিজিয়া আদায় করা শুরু হয় । অমুসলমানদের নিকট জিজিয়া আদায় করা হলেও দরিদ্র, বৃদ্ধ, অন্ধ ও পঙ্গুদের ঐ কর দিতে হত না । আবার সকলকে সমান হারে জিজিয়া দিতে হত না, ধনীরা ৪৮, মধ্যবিত্তরা ২৪ এবং নিম্ন-মধ্যবিত্তরা ১২ দিরহাম জিজিয়া কর হিসাবে প্রদান করতেন ।

আরবরা সমসাময়িক ভারতীয় সমাজে স্বীকৃত ব্রাহ্মণদের উচু মর্যাদা স্বীকার করে নিয়েছিল । মহম্মদ বিন কাশিম ব্রাহ্মণদের সততায় আস্থা রেখে প্রশাসনিক গুরুত্বপূর্ণ পদে কেবল ব্রাহ্মণদেরই নিয়োগ করতেন । আরবদের শাসনব্যবস্থায় স্বতন্ত্র ও সুগঠিত বিচার ব্যবস্থা ছিল। বিচার ব্যবস্থায় প্রধান ছিলেন খলিফার অধীনস্থ আমীর, সাধারণ অভিজাত সামরিক ও প্রশাসনিক অফিসাররা বিচার কাজ সম্পন্ন করতেন । আরবীয় বিচার ব্যবস্থায় অপরাধের জন্য কঠোর দন্ডদানের ব্যবস্থা ছিল । যদিও বিচারের ক্ষেত্রে হিন্দুদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচারণ করা হত না তা নয় । তবে রাজনৈতিক অপরাধ ছাড়া অন্যান্য অপরাধের ক্ষেত্রে হিন্দুরা নিজেদের পঞ্চায়েতে বিরোধের মীমাংসা করে নিত ।

মহম্মদ বিন কাশিম রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির দ্বারা উপলব্ধী করেছিলেন যে সিন্ধুদেশে আংশিক ধর্মীয় সহিষ্ণুতার নীতি গ্রহণ করাই হবে বাস্তবসম্মত । ধর্ম হিসাবে ভারতীয়দের প্রতি আরবদের ব্যবহারের দ্বারা ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হবে । তাই তিনি সিন্ধুদেশে এমন এক শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করেন যা নাকি ভারতীয়দের নিকট সুনাম অর্জনে সক্ষম হবে । বলাবাহুল্য মহম্মদ বিন কাশিম এই কাজে হিন্দুদের সহযোগিতা অর্জন করেন এবং তাদেরই সাহায্যে সিন্ধু দেশে এক কার্যকরী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন । আরব শাসকেরা সিন্ধুদেশে যে শাসননীতি অনুসরণ করেছিলেন পরবর্তীকালে তুর্কি বিশেষত আকবরের মতন মোগল শাসকদের নীতিতে তার ছায়া পাওয়া যায় ।

❖ **তুর্কি আক্রমণের প্রাক্কালে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা ঃ** অষ্টম শতকে আরব আক্রমণের প্রাক্কালে ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে দশম শতকের শেষ বা একাদশ শতকের সূচনায় ভারতের অবস্থার মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না । কিছু কিছু ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকলেও মূল বৈশিষ্ট্যাবলী একই ছিল । দেখাগেছে আরব আক্রমণ বা তুর্কিদের ভারত অভিযানের সময় ভারতে কোন কেন্দ্রীয় শক্তি ছিল না । বিভিন্ন অঞ্চলে অধিস্থিত ছিল পরস্পর বিবাদমান কয়েকটি স্থানীয় শক্তি । এইসময় হিন্দুকুশ পর্বতমালা থেকে পাঞ্জাবের চেনার পর্যন্ত বিস্তৃত পশ্চিম পাঞ্জাবে রাজপুত শাহীবংশ রাজস্ব করত । প্রায় ৩০০বছর ধরে এই রাজপুত শক্তি সাফল্যের সঙ্গে আরব আক্রমণ প্রতিরোধ করে এসেছে ।কিন্তু সমসাময়িক কাশ্মীর র‍্যাজের অবস্থা তখন সন্তোষজনক ছিল না।

আলোচ্য পর্বে উত্তর ভারতের অন্যতম প্রধান শক্তি কনৌজের দুর্বলতার সুযোগে দিল্লি-আজমীরে চৌহান, গুজরাটে চালুক্য, মালবে পারমার, বুন্দেলখন্দে চান্দেল্ল প্রভৃতি রাজপুত বংশের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় । দেবপালের মৃত্যুর পর বাংলার পাল বংশীয় রাজন্যবর্গ অত্যাধিক দুর্বল হয়ে পড়ে । অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও প্রতিবেশী রাজ্যগুলির আক্রমণে পাল সাম্রাজ্যের প্রাণশক্তি নিঃশেষ হয়ে যায় । দক্ষিণ ভারতীয় রাজ্যগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল কল্যাণের চালুক্য ও তাঞ্জোরের চোলরাজ্য । এদের মধ্যে অবিরাম যুদ্ধবিগ্রোহ চলত । এছাড়াও কদম্ব, গঙ্গ, যাদব, কাকতীয় প্রভৃতি ছোট ছোট পরস্পর বিরোধী রাজ্য ছিল । দেশের সামগ্রিক স্বার্থ উপেক্ষা করে নিজেদের শ্রেণিস্বার্থ রক্ষা করাই ছিল এদের মূল লক্ষ্য ।

ভারতীয় সমাজ তখন সর্বনাশের শেষ সীমায় এসে পৌছেছিল । আরবদের সিন্ধু জয়ের পর ভারত বিদেশি আক্রমণ থেকে কিছু দিনের জন্য মুক্ত থাকায় আগামি দিনে বিদেশি আক্রমণের কথা তাদের মাথায় আসেনি । ভারতীয় রাজন্যবর্গ সীমান্তের নিরাপত্তা ও আধুনিক সামরিক সংগঠন সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন । তাছাড়া ভারতবাসী তখন সংকীর্ণ মানসিকতায় এতই আচ্ছন্ন ছিল যে ক্ষুদ্র স্বার্থের কাছে বৃহত্তর স্বার্থ অবহেলিত থেকে গেছে । নিজেদের জাতিগর্বে তাঁরা অত্যাধিক উচ্চাশা পোষণ করত, নৈতিক মানের ক্ষেত্রেও তাদের চরম অবনতি ঘটেছিল । জাতিভেদ প্রথা, বর্ণপ্রথা, সতীদাহ প্রথা, অস্পৃশ্যতা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, কৌলিন্য প্রথা, দেবদাসী প্রথা প্রভৃতি সমাজের প্রাণশক্তিকে একবারে নিঃশেষ করে দিয়েছিল । এমনকি বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জীবনেও এর ছোঁয়া লেগেছিল । ধর্মের নামে ব্যাভিচার চলায় নৈতিকতা নিম্নগামী হয় ।

কৃষিকার্য ও সমৃদ্ধশালী বাণিজ্যের ফলে অর্থনৈতিক দিক থেকে ভারত সমৃদ্ধশালী দেশ ছিল । তাই ভারতীয় রাজন্যবর্গ, ধনী বণিক ও অভিজাত সম্প্রদায়ের হাতে ধনসম্পদ জমা হওয়ায় তারা বিলাস ব্যসনের মধ্যে দিয়ে দিনকাল অতিবাহিত করতেন । সমাজে ধন সম্পদ বণ্ঠনের ব্যবস্থা না থাকায় সাধারণ মানুষ, কৃষক ও কারিগররা ছিল অতি দরিদ্র ও চরম অবহেলিত । সামাজিক ন্যায়বিচারের অভাবে তারা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে । জাতীয় জীবনের এই সংকটময় পরিস্থিতিতে গজনীর সুলতান মামুদ ভারত আক্রমণ করেন । যুগ যুগ ধরে পুণ্যার্থীদের দানে মঠ-মন্দিরগুলি এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি স্ফীত হয়ে উঠেছিল । বলাবাহুল্য এই সব মঠ-মন্দিরগুলিই সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণের মূল লক্ষ্য ছিল ।

**----------0----------**

## Model Question (Marks - 5)

**১) সিন্ধু দেশে আরব শাসনের প্রকৃতি কি ছিল ?**

**২) তুর্কি আক্রমণের প্রাক্কালে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল ?**